দুঁহু কেরে, দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া

বুলবুল চৌধুরী

শ্রাবণের ঢলে ভেসে যাচ্ছিল চরাচর। আর আমি মেঘের ওই ঘনঘটায় চারদিকে পেয়েছিলাম সায়ংকালের পরশ। মাঝে ধারায় ধারায় গড়িয়ে যাওয়া বৃষ্টি ঠাঁই নিয়েছে সবে উঠে আসা জোয়ারের গায়ে। প্রকৃতির অমন মিথুনে চাঞ্চল্য জাগে মাছে মাছেও। ফলাফলে গভীর জলা ফেলে সব ভেসে চলে অনেক কিনার- কানার ধরে। খোঁজে খাবার।

জন্মেছি গ্রামে। মাটির ছোঁয়ায় কৈশোরেই হয়ে উঠেছিলাম যেনবা খানিক জল-কাদার প্রতিপালক। ছোট থাকতেই চলে গেছি নল্লার বোন্দে গরু চড়াতে। ধরেছি লাঙলের কুটি। কৌতূহল পুরাতে ভিড়েছি ফইড্ডা (খরগোশ) মারার দলে। আবার অপরূপ বিল-ঝিল-খালে ভরা পেয়েছিলাম গ্রামখানি। বর্ষায় সেসব ভাসিয়ে ভিটেমাটি অবধি ঠেক নিয়েছে টলমলে জোয়ার। তাকিয়ে স্বচ্ছ সলিলা-তলদেশ ভেদ করা গেছে। তাতে দেখেছি মাটির রেখা, শাপলা কিংবা অন্যান্য জলজ ঘাসের বেড়ে ওঠা এবং ফাঁকে ফাঁকে মাছের চলাচলতি।

আজ ভেবে পাই, সবের মাঝে মাছের নেশাই আমাকে ছুটিয়েছে সর্বাগ্রে। ওই টানে মৌসুম বুঝে জোয়ারের জলে দিয়েছিলাম কতেক কোপা ছিপ। আর শ্রাবণের কাইতাইন্না ঢলে মাথলা মাথায় বাইরে বেরোই বড়শিতে কি মাছ আটকালো দেখতে। ঘর ছেড়ে ফুল বাগান পেরিয়ে পুকুর ঘাটলায় উঠি উঠি মুহূর্তে কানে এসেছিল মানব-মানবীর মিলিত খিলখিল হাসির স্বরকম্পন।

বইছিল অঝোর ধারায় বৃষ্টি। পাশে পাশে চলতে থাকা হাওয়ার দাপটে মাথার মাথলা উড়ে যেতে পারে ভেবে সেটির সাথে থুতুনির নিচ অবধি দিয়েছিলাম রশির গিঁঠ। তবে মাথা রক্ষা করা গেলেও ততক্ষণে বায়ুতাড়িত জলে ভিজে একশা কিশোরই হয়ে উঠেছিলাম আমি। ফাঁকে আচানক হাসিতে দৃষ্টি সেঁটে যায় দৃশ্যে। দেখি কী, অবগাহনে নেমে নর-নারী বুক ঠাঁই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একে অপরের মুখে জল ছিটিয়ে দিতে দিতে এলায়

রাঙা রাজকন্যার মতোই ছিল ওর গাত্রবরণ। একরাশ কালো চুল গুছিয়ে এনে রাখত বুকের বাঁ দিকে। অজান্তেই তাতে কেটে যেত অনর্থক অনর্থক বাঁধন। খুলেও ফেলতে ফের অনায়াসে এবং যেনবা আপন অজান্তে। নিশ্চয়ই মেয়েটির রাঙা ঠোঁট কেঁপেও উঠত প্রেমের ঘন কোনো বাক্য বিন্যাসে...

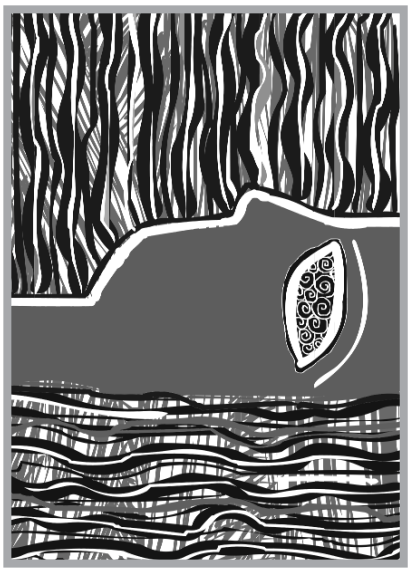

শুধু খিলখিল হাসিতে। ধাপে পৌঁছে ঠোঁটে ঠোঁট মিলায় দুয়ে। জড়াজড়ি হয়ে আলগোছে তলায় নিচে। ফের ভেসে ওঠে দম পেতে।

সেই হচ্ছে নারী-পুরুষের রহস্যময় সম্পর্কের প্রথম দ্যোতনা পাওয়া আমার। আর 'দোঁহারে দেখিছে দোঁহে'র মতো মানব-মানবীর ঠোঁটে ঠোঁট রাখার ওই ছবিখানি বড়ই মন্দ্রিত পাই পরে। খাল-বিল-ঝিলে নেমে জেনেছি কানকো ফুলিয়ে পিছল গায়ের মাছ কী অনমনীয় দ্রুততা নিয়েই না ছুটোছুটি করে। তবে নর-নারীর যুগল হয়ে ওঠা অমন দৃশ্যে মাছেরও অধিক জলকেলি লাগে নিজের ছায়ে।

মানুষের অনুভব না যায় মাপা, না তা কোনো ছাঁচে ঢালা সম্ভব। হরেক মুখের মতো হরেক চারণ তার। এখন বয়স বেড়ে চলা দিয়ে বুঝি, জন্মেই পাখির যেমন জোড়, মানব-মানবীর মিলনও তেমনি এক সত্যব্রত পালন।

আজ খেয়াল করে দেখি, কৈশোর না ফুরোতেই গ্রামের নিবাস ছেড়ে চলে এসেছিলাম ঢাকা শহরে। সত্যি, কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পৌঁছার মতো প্রাকৃতিক নিয়মেই মানুষ আপনাতে আপনি জোয়ার বুঝে ভাসায় মনের ভেলা। এদিকে আমি কিনা কি রহস্যময় এক ইঙ্গিত পেয়েছিলাম যেনোবা খানিকটা অল্প বয়সেই। আবার বয়স দিয়েই প্রেমের সত্যাসত্যে চিঠি লেখায় ইতি টানার মতো একখানা ইতিরেখাও যেন আমি মিলাতে গিয়েছিলাম ওই প্রেমেই।

প্রেমে ভালো লাগার ছোঁয়াটাই প্রথমে বীজ বুনে দিতে পারার মতো প্রথম পরিচয় নিশ্চয় এবং প্রেম অঙ্কুরিত হয় প্রেমিক-প্রেমিকার মাঝে পারস্পরিক তীব্রতার লালন-পালনে। নিজেও পরশ পেতে চাতকের মতো তৃষ্ণার্ত হয়ে মনের পাখনা মেলে ইতিউতি কত উড়েছি জোড়া পেতে। অবশেষে কলেজ জীবনে উঠে একজনের প্রতি তীব্র আকর্ষণ টের পাই। মেয়েটি পাশের বাসায় থাকতো। ওকে দেখতে পাওয়ার আশায় দ্বিতলের জানালায় প্রহরের প্রহর পর দাঁড়িয়ে রয়েছি। বড্ড পরদা মেনে চলা পরিবারের মেয়েটি ঠিক ঠিকই কিন্তু আমার চাহনি ধরে ফেলে।

প্রতিবেশী হলেও ওই বাড়ির কোনো মেয়ের সাথে কথা বলার সুযোগ ছিল না কঠিন পরদা প্রথার কারণেই। ফলে মুখোমুখি থেমে এক-আধটু বোলও পরিস্ফুট করতে পারিনি। ভালোবাসার প্রথম ধাপে দুয়ের চাহনি এক কেন্দ্রবিন্দুতে মিলিত হলেও ভিতরের ভাব যে অব্যক্ত থেকে যায়! উপায় পেতে অস্থির-চঞ্চল হয়ে উঠি।

গ্রামে থাকতে ট্রাংক খুলে নানীকে প্রেরিত নানার কতেক চিঠি হস্তগত হয়েছিল। তাতে ছাপার হরফে লেখা ছিল, 'যাও পাখি বল তারে, সে যেনো ভোলে না মোরে।' সাথে সাথে ঠোঁটে খাম নিয়ে একটি ছোট পাখির উড়ন্ত ছবিও মুদ্রিত পাই। ব্যাপারটা ভেবে উঠতেই আপন আবেগের জোয়ারে ওর জন্য রচি কয়েক ছত্র প্রেমের আকুতি।

মেয়েটি থাকত পাশের দ্বিতলে। আমাদের সীমানা-প্রাচীরের ওপার জুড়ে তাদের একফালি বাঁধানো উঠোন। একদিন সুযোগ বুঝে চিঠির সাথে ইটের টুকরো বেঁধে ছুড়ে দেই উঠোনের প্রান্তে। বিনিময়ে ও নিজেও কয়েক হরফ লিখে কেউ কোথায় নেই এমন নিরাপদ মুহূর্ত বুঝে তা ঢিল বেঁধে ছুঁড়ে দেয় গলিপথে। আমিও নির্জনতায় কুড়িয়ে তুলি মুঠোয়।

রাঙা রাজকন্যার মতোই ছিল ওর গাত্রবরণ। একরাশ কালো চুল গুছিয়ে এনে রাখত বুকের বাঁ দিকে। অজান্তেই তাতে কেটে যেত অনর্থক অনর্থক বাঁধন। খুলেও ফেলতে ফের অনায়াসে এবং যেনবা আপন অজান্তে। নিশ্চয়ই মেয়েটির রাঙা ঠোঁট কেঁপেও উঠত প্রেমের ঘন কোনো বাক্য বিন্যাসে। শেষাবধি সব অস্ফুট থেকে যায় দুয়ের মাঝে বিদ্যমান কঠিন বিধিনিষেধের বেড়াজালে।

তারও কিছু বাদে জীবনানন্দ দাশের কবিতায় পড়ি, "কী কথা তাহার সাথে/তার সাথে..." ইত্যাদি ইত্যাদি পুরোটাই। সত্যিই, সেই বয়সে প্রেমের স্রোতে ভেসে ভেসে চিঠিতে কি আবেগ ফলিয়েছিলাম স্মরণে নেই কিচ্ছুটি। ভাবতাম ওকেই আমি বিয়ে করব। পাশে পাশে শ্রাবণের ঢলে মানব-মানবী জলকেলির দৃশ্য মনে জাগায় কল্পনায় কী গভীর চুমুই না এঁকে দিয়েছি প্রণয়নীর ঠোঁটে।

তবে আমার এ প্রেম মোটেও স্থায়ী হয়নি। হঠাৎ পাওয়ার মতো হঠাৎ মিলিয়েও যায় সময়ের মোচড়ে। পারস্পরিক তীব্রতায় আমি বোকার মতো অনুক্ষণ জানালায় দাঁড়িয়ে থাকার ফলে মায়ের ভেতরে সন্দেহ উঁকি দিয়েছিল। তিনি লুকিয়ে লুকিয়ে দুয়ের কার্যকলাপ আবিষ্কার করতে পারেন।

এ নিয়ে কঠিন প্রশ্ন ওঠে পরিবারে। আমাকে রাখা হয় তারও বেশি কঠিন প্রহরায়। ফলাফলের গোপন ফাঁস হয়ে যাওয়ার মতো জরুরি খবর লিখে ওকে চিঠি দেওয়া দূরে থাকুক, জানালায় দাঁড়িয়ে দুয়ের যে দৃষ্টি বিনিময় হবে সেই উপায়ও থাকে না।

দিন ফুরিয়ে রাত নামে আকাশে। সবাই ঘুমিয়ে গেলে চুপি চুপি গিয়ে দাঁড়াই জানালার পাশে। ও জানতেই পারে না। এমন কয়েক রাত কাটিয়ে এক বিকেলে কলেজ থেকে বাসায় ফিরে থমথমে দেখি সবাইকে। মাঝে এসে ছোটভাই দুঃসংবাদ জানায়। শুনি যাকে ভালোবেসে চিঠি লেখা আমার সেই মেয়েটি একগাদা আফিম গিলে নাকি হাসপাতালে আছে।

ভাগ্যে বেঁচে ওঠে ও। ক্রমে ক্রমে কানে খবর আসে যে, প্রেমিকার বাবা প্রতিরাতে আফিমের সাথে এক গ্লাস দুধ খেয়ে বিছানায় যেতেন। সেখান থেকেই ওর এসব পাওয়া। আর ঘুমের ভেতর দিয়ে মরে যেতেই ও চুরি করে আফিম গিলেছিল।

গ্রামে থাকতে নানার সংগ্রহ থেকে পেয়েছিলাম কতেক বই। বয়সে উঠে ডা. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ অনূদিত 'দিওয়ানা হাফিজে'র পাতা উল্টেছিলাম। সবের মাঝে ওই ছত্রই বেশি বেশি আলোড়িত পাই- ওই যে লেখা হল, " ওগো সাকী দাও পিয়ালা ভুলবো জ্বালা পান করিলে/প্রথমে প্রেম সহজ ভেবে পড়েছি আজ কী মুশকিলে...।"

সময়ের সিঞ্চনে বয়সের বড়ই জল-ভ্রমিতে পৌঁছে আজও তো আমি সেই জিজ্ঞাসায় আত্মায় আত্মায় বিষাদে, আপমানে, ব্যর্থতায় সঙ্কুচিত হয়ে আসি। হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার ক'দিন পরেই মেয়েটিকে তড়িঘড়ি পাত্রস্থ করেছিল তারা। বাসা বদলে পরিবারটা অন্যত্র স্থানান্তরিতও হয়। হদিস মেলাতে পারি না কোনো সূত্রেই।

জিজ্ঞাসা তো বারেবারেই উছলে উছলে চলে। সত্যি, মেয়েটির আত্মহত্যা করতে যাওয়ার পেছনে কী কারণ নিহিত ছিল? আব্বা কী এ বিষয়ে মেয়েপক্ষকে কোনো

যাকে বউ ডাকতে শিখেছিলাম সেই ও আজ পরের ঘরণী। নিজেও আলাদা সংসার পেতেছি কবেই। যেখান থেকে কাপুরুষের মতো পালিয়ে আসা সেই বৃত্তে পরে আমি জড়িয়ে যাই বুঝি গুরুর আশীর্বাদেই। বন্ধুত্বের প্রমাণ পেতে বিয়ের পরেও মেয়েটি আমার পিছু ছাড়ে না...

ইঙ্গিত দিয়ে থাকবেন? নাকি আমার প্রেরিত চিঠিগুলো ওই পরিবারে ফাঁস হয়েছিল? অথবা হতে পারে, আমি অমন মুখ ফিরিয়ে নেওয়ায় অপমানের প্রতিশোধ ভেবেই ও আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল।

এত পাশে পাশে রইলেও দুয়ের কথা হলো না। অক্ষরে অক্ষরে প্রেমের ফুল গেঁথে উঠবার আগে অদৃশ্যে মিলাবার মতো ওকে হারাই আমি। এই ঘটনার চিত্তের চাঞ্চল্য খোয়া যায় আমার।

অপরাধ ছিল না আমার। তবুও আপনার কাছে আপনি দোষী হয়ে রই। মরমে মরমেও যাতনা বহে সমান ধারাতে। মনে পড়ে, স্কুলের সহপাঠী লেখক কায়েস আহমদের সাথে বিউটি বোর্ডিং-এ ঢুকে পেয়েছিলাম সাহিত্যের আড্ডা। ওইসব সঙ্গ পেয়ে দলে নাম তুলবার মানসে নিজেও ধরেছিলাম লেখক হওয়ার আকাঙ্ক্ষা। সময়ে কলমের আঁচড়ে স্থায়ী করতে চেয়েছি প্রেমে না পাওয়ার এই বেদনাখানি। অথচ নানা অনুভবে পাতার পর পাতার ভরে গেলেও আমার এসব বহুকালই হয়ে রইল অনুক্ত।

কায়েস আহমদই আমাকে সবিশেষ প্রাণিত করেছিল লেখক হতে। আবুল হাসানের সান্নিধ্যে আমি তারও বেশি প্রভাবিত হয়ে কবির ছন্নছাড়া জীবনের সাথে নিজেকে একাকার করে দিয়েছিলাম। দেখেছি একই ছাদের তলে বাস সত্ত্বেও প্রণয়নীকে তিনি আলাদা পালঙ্কে রেখে নিজে শুয়েছেন আলাদা চাদর বিছিয়ে। তার সেই বিধি আমিও তো আগেই ভাগ্যে পেয়েছিলাম আর এক আধারে!

জীবনটা জানি কেমন হয়ে যায়। মগ্ন স্বভাবের কারণে বাসা ছেড়ে উঠি অন্যত্র। চাকরির পয়সায় কবি-লেখকদের আড্ডায় ঘুরে নিজের ব্যয়ভার চমৎকার চলে যাচ্ছিল। মাঝে পরিবার থেকে খোঁজ নিতে আসেন অনেকেই। সংসার পাতবার তাড়া দেন সবাই। আমার কিন্তু হয়ে ওঠে না।

মেয়েটিকে না পাওয়ার দহন আমাতে জন্মাবার কারণ একটাই। ও যদি আত্মহত্যায় ব্রতী না হতো তাহলে কী এত করুণ কথকতার জন্ম হয়?

প্রেম না পাওয়ার অন্য একটি বেদনামুখর সত্য পরেও আমি নিজের জীবন দিয়েই আয়ত্ত করলাম। পরিবারের তাগাদা সত্ত্বেও বহুদিন বিয়ে করা হয় না আমার। ইতিমধ্যেই বয়স বেড়ে ওঠে যথেষ্ট। এই সময়েই আমার এক বন্ধু পত্নীর পীড়াপীড়িতেই পাত্রী দেখতে স্বীকৃতি জানাই। শুনি, কনে তারই বান্ধবী। শেষে ওই বাসাতেই দুয়ের সাক্ষাতের ব্যবস্থা হয়।

চলার পথে নিরাভরণ কনে ওই প্রথম আমার চোখে পড়া। পরিচয়ের পর থেকে ধরে দুয়ের যোগাযোগ অনেকবারই ঘটেছে। তখনও পেয়েছি মেয়েটিকে অলঙ্কারবিহীন। বদলে হাতে শুধু শোভা পেত একখানা সময়ের ঘড়ি।

ভালোবাসা বলতে যেমনটা বোঝায় সে রকম কোনো অনুভূতিই জাগেনি ওকে কাছে পেতে। ছুঁয়েও দেখিনি কোনো মুহূর্তে। তবে আমার প্রেমিকাই হয়ে উঠেছিল মেয়েটি। আমাকে পেতে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখাত। একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, কে আমি আপনার বলুন তো?

উত্তর দিতে থেমেছিলাম সত্যি। আর ও হেসে সূত্র ধরিয়ে দেবার মতো বলেছিল, বউ, বউ আমার নাম।

আরও কত কি তাজ্জব তাজ্জব আবেগ ঢেলে চলছিল ও। মনস্থির করি ভালোবাসা না হোক, এও তো ভাগ্যে পাওয়া আমার। বরণ না দিই কেন? অবশ্য ওকেও বউ করা হয় না আমার। কেননা, এই প্রস্তাব শুনে দুই পরিবার খুবই বেঁকে বসে। চাকরির পয়সায় ওকে নিয়ে ঘর বাঁধবো তেমন হিসাব মেলাতে গিয়ে দেখি এ সম্ভব নয়।

ওদিকে পরিবারের দিক থেকে মেয়েটিকে অন্যত্র বিয়ে দেয়ার চাপ ছিল। বাস্তবতার নিরিখে ও আমার মুখোমুখি হলে ফিরিয়ে দিই কিছুটা যেনবা রুক্ষ ভঙ্গিতে। ওতে ও জবাব দিয়েছিল, ঠিক আছে, যাচ্ছি। তবে বিয়ে হয়ে গেলেও আপনার এই বন্ধুকে কিন্তু ভুলে যাওয়া চলবে না।

আমার গুরুদেব আবু শাহ্‌রিয়ার কানে শুনতে পান না। তাঁর সামনে বসে কাগজে লিখে লিখেই তাবৎ কথা শোনাই আমি। প্রিয় শিষ্যের টানাপড়েন তিনি অবগত ছিলেন। শেষবারের অবস্থা ব্যক্ত করতেই গুরুদেব মুখে কোনো মন্ত্র না দিয়ে কাগজের গায়ে লিখেছিলেন, দুঃখ পাবেন না। জানতেন আপনার এই না পাওয়াই একদিন প্রেমের বড় ফুল হয়ে উঠবে।

যাকে বউ ডাকতে শিখেছিলাম সেই ও আজ পরের ঘরণী। নিজেও আলাদা সংসার পেতেছি কবেই। যেখান থেকে কাপুরুষের মতো পালিয়ে আসা সেই বৃত্তে পরে আমি জড়িয়ে যাই বুঝি গুরুর আশীর্বাদেই। বন্ধুত্বের প্রমাণ পেতে বিয়ের পরেও মেয়েটি আমার পিছু ছাড়ে না। বাধ্য হয়েই যাই তাদের বাসায়। স্বামীকে আমার বিষয়ে কী কী জানান হয়েছে সেই প্রশ্ন তুলি না ওকে। তাদের খাবার টেবিলে বসে গৃহকর্ত্রীর বন্ধু হিসেবে। ওর স্বামী থাকেন আমার গা ঘেঁষা চেয়ারে। সযতনে দুয়ের পাতে খাবার সাজাতে গিয়ে সেবারে আমাকে অজান্তেই ও ঢেলে দিয়েছিল বেশি। অমনি ভদ্রলোক অনুযোগ করলেন, আমি বুঝি কিছু নই?

জবাবে ও অপ্রতিভ হেসে স্বামীর পাতে ঢেলে দেয় তারও বেশি।

রাতে রাতে ফোনে অনেক কথা হয় দুয়ের। সবের মাঝে থেমে থেমে বউ একটা প্রশ্নই শুধোয়, কবে আসছেন বাসায়?

বলি, না, যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। আর নয়।

কেন?

তুমি আমার পাতে খাবার দিতে গিয়ে কি কাণ্ড ঘটালে? না, না, তাকে ছোট করা কেন?

সে উত্তরে না গিয়ে সে শুধু জানতে চায়, কবে আসছেন?

কঠিন করে বলি, যা হবার হয়ে গেছে। তোমার ঘরে ইহজন্মে আমি আর পা রাখছি না।

আমাকে না দেখে থাকতে পারবেন?

প্রথম কদম ফুলের মতো প্রথম প্রেমে প্রণয়নীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জবাবদিহির সুযোগ পাইনি। ওই না ভোলা কথকতায় আর এক বিষণ্নতার নতুন সুর তোলে আমার বউ ডাকা মেয়েটি। অবশ্য সব যাতনা ধরে রাখার মতো দুয়ের সাক্ষাৎ নিরন্তর প্রবহমান তো অন্তরে অন্তরেও। সেই অনুভব আমি জানাই ওকে। বলি, তোমাকে তো আমি দেখছি আর দেখেই চলেছি বউ। ফোনে ভেতরের দিয়ে স্পর্শ করেও আছি এক্ষনে।

জবাব আসে না। তিন সত্য করার মতো করে ডাকি, বউ, বউ, বউ!

না পাই উত্তর।